জয়পুরহাট জেলা

অনেকগুলো লাশের স্তূপ

আমার আজও মনে পড়ে ১৯৭১ সালের কথা। আমার বয়স তখন ৪০ বছর। আমি মাঠে ধান কাটছি। তখন এক দল পাকহানাদার এসে আমাকে ও আমাদের গ্রামের তিনজন লোককে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এলো। তারপর আমাদের দিয়ে তাদের গাড়ি ঠেলে নিল। আমাদেরকে প্রায় দুই কিলোমিটারের মতো গাড়ি ঠেলে দিতে হলো। আর রাস্তার ধারে দেখি প্রায় ১০০/২০০ পাকহানাদার দাঁড়িয়ে আছে। এভাবে আরও দেখি অনেকগুলো লাশের স্তূপ। তখন আমাদের বলল, গাড়ি থামাও। তারপর আমরা গাড়ি থামালাম। সেখানে আবার কয়েকজন লোককে বাড়ি থেকে ডেকে আনল। তাদেরকে দিয়ে আবার গাড়ি ঠেলে নিল। তখন আমাদেরকে বলল, হে বাঙালি হটো। তখন আমরা এক দৌড়ে বাড়ি ফিরে এলাম। এতবড় ঘটনা জীবনে কোনোদিন দেখিনি। তাই আজও মনে পড়ে ১৯৭১ সালের কথা।

সূত্র: জ-৭৮৯৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. আসাদুজ্জামান	**মো. শাদুল হোসেন**
আলমপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	থানা : ক্ষেতলাল, জেলা : জয়পুরহাট
৮ম শ্রেণি, রোল : ০৪ ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট	বয়স : ৭৭ বছর, সম্পর্ক : দাদা

কারণ তারা ছিল বাঙালি

আমাদের গ্রামে পাকহানাদার বাহিনী এসেছিল। তারা এসে গ্রামে ঘোষণা দিল গ্রামের সকল মানুষকে আলমপুর স্কুল ময়দানে উপস্থিত হতে হবে। পাকহানাদার বাহিনী গ্রামে সকল বাড়িতে এসে বৃদ্ধ মা-বাবা, ভাইবোন সকলকে নিয়ে স্কুল ময়দানে দাঁড় করায়। গ্রামের সবাই স্কুল ময়দানে উপস্থিত হয়। কিন্তু আমার দাদির মা এবং পাশের বাড়ির আমার বড় মা সেখানে যায়নি। আমার বড়মা বলেন, পাকিস্তানি পোষা কুকুরদের হাতে আমাকে যদি মৃত্যুবরণ করতে হয় তাও ভালো। কিন্তু তবু আমি স্কুল ময়দানে যাবো না। তিনি ছিলেন পর্দানশীন মানুষ। তিনি ঘরের বাইরে বের হবেন না। তিনি আল্লাহকে খুব ভয় করেন। তারপর পাকহানাদার বাহিনী সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সবাইকে দাঁড় করিয়ে রাখে। তাদের শাস্তি হলো প্রচণ্ড রোদে দাঁড়িয়ে থাকা। কারণ তারা ছিল বাঙালি। আমাদের গ্রামে কয়েকজন রাজাকার ছিল। তারা আমাদের গ্রামের কে কে মুক্তিবাহিনী সে খবর পাকবাহিনীকে দিত। কিন্তু আমি তাদের নাম লিখব না। কারণ তারা আজ আমাদের গ্রামের মুরুব্বি। তারা এখন তাদের কুকর্মের শাস্তি ভোগ করছে।

আমাদের গ্রামে আরও একটি ঘটনা আছে, তা হলো পাকবাহিনী ছিল মুসলিম, সে কারণে তারা হিন্দুদের ওপর খুব নির্যাতন করত। আমাদের পাশের গ্রামে হিন্দু সমাজের লোক বাস করত। সেই গ্রামের মুসলমানরা নিজ বাড়িতে হিন্দুদের আশ্রয় দিত। এদের মধ্যে ছিল একজন গর্ভবতী। সে নিজের সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের মাথার সিঁদুর তুলে নেয়। সে এক বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পাকবাহিনী আমাদের ওপর এ রকম অত্যাচার করত।

সূত্র: জ-৭৯১৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. আলামিন মিয়া	**কামরুল হাসান**
আলমপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	থানা : ক্ষেতলাল, জেলা : জয়পুরহাট
১০ম শ্রেণি, রোল : ০৭	বয়স : ৫৪ বছর, সম্পর্ক : ভাই

সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যাবেন

আমি যার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জেনেছি তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালে তিনি পাঁচবিবি এলবিপি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। তিনি কর্নেল নূরুজ্জামানের অধীনে ৭নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন। ২০ মার্চ পাকবাহিনী পাঁচবিবিতে ব্যাপক গোলাগুলি ও অগ্নিসংযোগ করে। তখন তিনি পরিস্থিতি ভালো না বুঝে তার ছোট ভাইবোনসহ মা-বাবাকে নিয়ে ভারতে চলে যান। যাওয়ার কয়েকদিন পর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যাবেন। তারা যেখানে থাকতেন তার কিছুদূর পর কামারপাড়া অপারেশন ক্যাম্প। কামারপাড়া গিয়ে তার সাথে দেখা হয় যুব নেতা আবু সাঈদ সাহেব ও আরো অনেকের সাথে। কামারপাড়া অপারেশনে ভর্তির ব্যাপারে তদারকি করতেন তার এক বাল্যবন্ধু আব্দুস সাত্তার। তিনি তার সাথে কথা বলে ভর্তি হলেন। ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর তারা ৬০-৭০ জন উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের শিলিগুড়িতে রওনা হলেন। তাদের সার্বিক সহযোগিতা করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। তারা যথাসময়ে সেখানে পৌঁছে উচ্চতর ট্রেনিং গ্রহণ করে আবার কামারপাড়া ক্যাম্পে ফিরে আসেন। কামারপাড়া অপারেশন ক্যাম্পে তিনি আব্দুল মোত্তালেবের প্লাটুনে যোগ দেন। যোগ দেয়ার পর তিনি বিভিন্ন স্থানে অপারেশনে যান। অপারেশনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো উচনা-হিলি সীমান্তে তারা সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১০ ডিসেম্বর পাকিস্তানিদের সাথে তাদের যুদ্ধ বাধে পাঁচবিবিতে। ১১ ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা পালিয়ে যায় বগুড়ার দিকে। ১২ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা ওই পাঁচবিবি হানাদার মুক্ত করেন। এ দিন জেঠা এবং কমান্ডার মো. মোত্তালেব পাঁচবিবি এলবিপি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। দুই মাস পর সরকারি নির্দেশে বগুড়া আজিজুল হক কলেজে গিয়ে সেখানে কিছু দিন থাকার পর সরকারি আদেশে তাদের অস্ত্র গোলাবারুদ যা ছিল তা লেফটেন্যান্ট আমিনুল সাহেবের কাছে হস্তান্তরপূর্বক আমার জেঠা বাড়িতে ফিরে আসেন।

সূত্র: জ- ৭৭৮২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
অনিমেষ কুমার ঘোষ	**মনোরঞ্জন ঘোষ** (মুক্তিযোদ্ধা)
এলবিপি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : দমদমা, পোস্ট : পাঁচবিবি
৮ম শ্রেণি, শাখা-খ, রোল : ২৫	জেলা : জয়পুরহাট
	বয়স : ৫৬, সম্পর্ক : জেঠা

রান্নাও বন্ধ হয়ে গেল

আমাদের বিদ্যালয়টি পাঁচবিবি কামদিয়া হাই রোডের উত্তর পাশে অবস্থিত। মাটি ও বেড়া দিয়ে তৈরি বিদ্যালয় গৃহটি। একদিন বিদ্যালয় মাঠে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে শতকিয়া নামতা ধারাপাত বেশ সুরে সুরে পাঠ করি। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ অতিক্রম করেছে। দেশের অবস্থা ভালো না। আমাদের কী করা উচিত তা ভেবে উঠতে পারছিলাম না। আমার কাকার একটি রেডিও ছিল। সবাই একত্র হয়ে সেখানে খবর শোনার চেষ্টা করি। গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান সমান সংখ্যক লোক বাস করে। প্রতিদিন আশপাশের গ্রামগুলোতে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়। আমাদের ঘুম একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। আতঙ্কের মধ্যে দিনরাত কাটতে লাগল। রান্নাও বন্ধ হয়ে গেল। এরই মাঝে একদিন বিশাল পাক সাঁজোয়া গাড়িবহর পূর্বদিক হতে পাঁচবিবি অভিমুখে আসতে থাকে। গাড়িগুলোর রং ছিল সবুজ। শোনা গেল কামদিয়া ও ঘোড়াঘাটের সম্মুখে তারা যাকে পেয়েছে তাকেই গোলার আঘাতে হত্যা করেছে। দিনটি ছিল শুক্র কিংবা মঙ্গলবার, পাঁচবিবি হাটের দিন। সেদিন অনেক পথচারীর দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমাদের গ্রামের বজলুর বাবাকেও সেইদিন প্রাণ হারাতে হয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে

আমরা পাশের গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিই। সকলে বলাবলি করতে থাকে আমাদের গ্রামে মিলিটারি আসবে কিন্তু তারা আসেনি। এরই মাঝে আমাদের গ্রামটি লুট হতে থাকে। রাতে আমার কাকার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। আগুনে কাকার আমগাছ ও কাঁচা আমগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তা দেখে কাকার খুব দুঃখ হয়। চতুর্দিক থেকে খবর আসছিল হানাদার বাহিনী শত শত লোককে লাইন করে গুলি করে মারছে। ছোট বাচ্চাদের বাবা-মার সামনে টেনেহিঁচড়ে মেরে ফেলছে।

আমাদের গ্রামটি সীমান্ত থেকে বেশি দূরে নয়। দল বেঁধে এ দেশের ভীতসন্ত্রস্ত মানুষগুলো ভারতে যেতে থাকে। অনেকে হানাদার ও রাজাকারদের হাতে ধরাও পড়ে। আমাদের গ্রামের ও পাশের গ্রামের মানুষ আমাদের রক্ষা করার জন্য খুব চেষ্টা করে। তারা রান্না করে আমাদের খাওয়ায়। সে বছর আমার কাকার জমিতে তরমুজ আর বাঙ্গি লাগানো হয়েছিল। ফলনও হয়েছিল প্রচুর, কিন্তু ফলগুলো তখনও পাকেনি। কিছু মুসলমান প্রতিবেশী আমাদের বলে আপনারা দেশ ছেড়ে যাবেন না। আমাদের যা হবে আপনাদেরও তা হবে। কিন্তু লুটপাট আর অগ্নিসংযোগের দৃশ্য দেখে আমাদের সব সাহস ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

এভাবে গ্রাম ছেড়ে দিয়ে পাশের গ্রামে সাবধানে থাকি। দল বেঁধে ভীত মানুষদের পালানো দেখি আর নানা লোমহর্ষক ঘটনা সীমান্তের নিকটে শুনতে পাই। এভাবে এপ্রিল মাস পেরোতে থাকে। আমাদের মুরব্বি সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় আজ রাতে আমরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে যাব। আমাদের সব বন্দোবস্ত ঠিক। ওই গ্রামের কয়েকজন সাহসী নওজওয়ান ঝুঁকি নেয় আমাদের ভারতে পার করে দিয়ে আসবে। আমাদের সঙ্গী ছিল ছেলে-মেয়ে ও শিশু সন্তানসহ প্রায় ৪০০-৫০০ জনের মতো। দেশের মধ্যাঞ্চলের একটি দলও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। প্রায় ৮ থেকে ৯ কি.মি রাস্তা। শিশুসন্তানসহ আমরা সন্ধ্যার সময় রওনা হই। এরই মধ্যে পাক মিলিটারিরা তুলসীগঙ্গা নদী বরাবর তাদের টহল জোরদার করেছে। আমরা আশ্রয় নিই কাশিয়া বাড়ির এক জনমানবশূন্য ভুতুড়ে বাড়িতে। সেখানকার সবাই আগেই দেশ ছেড়েছে। সেখান থেকে হানাদার বাহিনীর টহল দেখা যায়। তাদের টহলের ফাঁকে খুব কম সময়ে আমরা নদী পার হয়ে রেললাইন থেকে পূর্বে ৩ কি.মি দূরে একটি নির্জন জঙ্গলে স্থান নিই। তখন খুব অন্ধকার। তবে একটি কথা আমার খুব ভালো মনে পড়ে। আমি একাই কোমর পানিতে নদী পার হয়েছি মা আমাকে সাহায্য করেনি। কারণ তার কোলে ছিল আমার ছোট ভাই ও কাপড়-চোপড়ের পুঁটলি। এক রাজাকার বিহারি আমাদের পথরোধ করে, তখন আমাদের আতঙ্ক আরো বেড়ে যায়। সকলে ঈশ্বরের নাম নিই। তখন আমাদের নওজওয়ান সাহায্যকারীরা উপস্থিত সকলের মাথাপ্রতি ১০ টাকা হারে চাঁদা দেয় এবং পাঞ্জাবিদের হাতে ধরা পড়বো না বলে আশ্বাস দেয়। দ্রুত সাবধানে রেল লাইন পার হতে বলে।

সম্ভবত রাত বারোটার পূর্ব মুহূর্ত হতে পারে– বাগজানার অদূরে আমাদের আশ্রয় লওয়া জঙ্গলটিতে কাকার একমাত্র কন্যা, বয়স মাত্র ৫ মাস, সে হঠাৎ কান্না শুরু করে। তার কান্না কোনোমতোই থামানো যায় না। বাচ্চার কান্নার শব্দে চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। সকলে ভাবে মিলিটারি আমাদের ঘেরাও করবে। আমাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করবে। সকলে ঈশ্বরের নাম জপ করছিল।

আমাদের নওজোয়ানরাও জীবনের মায়া ছাড়তে বসেছে। তারা এবং আমাদের মধ্যে যারা বাঁচতে চায় তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো আমার কাকার কন্যাটিকে গলা টিপে হত্যা করা হবে। যেই সিদ্ধান্ত সেই কাজ। কন্যা সন্তানটিকে মায়ের কোল থেকে কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রচেষ্টা চলে কিন্তু মা কোনোক্রমেই বাচ্চাটিকে দিতে চায় না। কিন্তু উপায় নেই বাচ্চাটিকে দিতেই হবে। বাচ্চাটিকে মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিতেই বাচ্চাটির কান্না থেমে যায়। ফলে বাচ্চাটিকে আর হত্যা করা হলো না। এরই মাঝে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা দুটি বিষধর সাপ মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তারা চলে গেল। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। সাপের ভয় আমরা করিনি। নওজোয়ানরা খবর নিয়ে এলো চারটার মধ্যে রেললাইন পার হতে পারলে সকলের প্রাণরক্ষা হবে। কেননা ক্লান্ত পাঞ্জাবিরা ভোরে ঘুমিয়ে পড়বে। জীবনের মায়ায় মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে আমরা রেলপথ পার হলাম।

আজ ২০০৮ সালে আমার কাকার কন্যা অনেক বড় হয়েছে, বিয়ে হয়েছে, তার বড় সন্তান এসএসসি পরীক্ষার্থী আর মেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে।

সূত্র: জ- ৭৭৮৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
আশিক চন্দ্র দাস	**গোপাল চন্দ্র দাস**
পাঁচবিবি এলবিপি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৪৬, সম্পর্ক : কাকা
৮ম শ্রেণি, খ শাখা, রোল : ১০	

পাকবাহিনী পিছু হঠতে থাকে

আমার মামা মো. আবুল খায়ের মণ্ডল, গ্রাম পাড়ইল, উপজেলা পাঁচবিবি, জেলা জয়পুরহাট, তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের আট তারিখে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্ত র্গত কুমাইল রিক্রুট ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভর্তি হন। সেখানে ১০-১২ দিন থেকে মেডিকেল করার পর ৩০ এপ্রিল তাকে শিলিগুড়ি পানিঘাটাতে ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠায়। আমার মামা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সেখানে ২০-২২ দিন থ্রিনটথ্রি ও মার্কফোর রাইফেল, এসএলআর, এলএমজি, থার্টি সিক্স হ্যান্ড গ্রেনেড ও এক্সপ্লোসিভের ট্রেনিং নেয়। ৩০ এপ্রিল ট্রেনিং শেষ করার পর তাকে ভারতের সাব-সেক্টর সবরা অপারেশন ক্যাম্পে যুদ্ধের জন্য পাঠানো হয়। অপারেশন ক্যাম্পে আমার মামা সর্বপ্রথম ২৮ মে রাজশাহীর ডাঙ্গির বর্ডারে পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ওই দিন খুব ভোরে ডাঙ্গির ঘাটে শত্রুসেনার ঘাঁটির ওপর অ্যাম্বুশ নেয়। ভোর সাড়ে ছয়টার সময় শত্রুসেনা এবং রাজাকার দল অতি নিকটে এলে মামার হাতে থাকা এসএলআর দ্বারা হানাদারদের ওপর গুলি চালায়। উভয়পক্ষের গোলাগুলিতে মামার পক্ষের দুই-তিন জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয় এবং শত্রুপক্ষের আট-নয় জন মারা যায়। অপারেশন শেষ করে দুই দিন পর ক্যাম্পে ফেরত আসে। তারপর জুন মাসের ১৫ তারিখে আবার পাগলা দেওয়ান শত্রুর ক্যাম্পে আক্রমণ করার জন্য পাঠায়। সেখানেও অ্যাম্বুশের মাধ্যমে পাকবাহিনীর সাত-আট জন সেনাকে মারা হয়। মামাদের পক্ষের একজন মুক্তিযোদ্ধা শেলের আঘাতে আহত হয়। এরপর আমার মামা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কড়িয়া, হিলি, ভুইডোবা, আমবাড়ি, কাটলা, চরকাই ইত্যাদি এলাকায় যুদ্ধ করে। জুলাইয়ের শেষের দিকে মামা দুধ ফেরিওয়ালা হয়ে জয়পুরহাট, পাঁচবিবি, বড়মানিক, কড়িয়া বাগজানা, হিলি শত্রুর ঘাঁটি রেকি করতে যায়। আর সেই মোতাবেক বিভিন্ন শত্রুর ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়। ভারত ও বাংলাদেশ যৌথভাবে হিলিতে আক্রমণ চালায়। তাদের আক্রমণে পাকবাহিনী পিছু হঠতে থাকে। আমার মামা সেই দলে ছিলেন। ১২ ডিসেম্বর ভুইডোবা হয়ে বাগজানা, ধরঞ্জী, কড়িয়া ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হয়। সেই সংবাদ পাওয়ার পর শত্রুসেনারা পিছু হটে পাঁচবিবি ঘোড়াঘাট দিয়ে বগুড়ার দিকে পালায়। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

সূত্র: জ- ৭৭৮৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. সাইদার ইসলাম	**মো. খয়বার (নানা)**
এলবিপি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	**মো. আবুল খায়ের (মামা)**
৬ষ্ঠ শ্রেণি, খ শাখা, রোল : ০৫	

মুক্তিযোদ্ধাদের ভাত রান্না করতেন

আমার নাম কামরুন নাহার। আমি মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা শুনেছি আমার খালার নিকট থেকে।

সেদিন ছিল সোমবার, তারিখ ০৭. ০৬. ১৯৭১ রাত ১২:৩০ মিনিট। আমার খালা তখন মুক্তিযোদ্ধাদের ভাত রান্না করতেন। প্রায় ৩০ মিনিট আগে ভাত রান্না করে তার দুটি বাচ্চা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। দুই বাচ্চার মধ্যে ছোট ছেলের বয়স ২২ দিন এবং বড় মেয়ের বয়স ৯ বছর। সবার মনে আতঙ্ক। কখন বুঝি হানাদার বাহিনী এসে পড়ে। হঠাৎ হৈচৈ শুনে খালার ঘুম ভেঙে গেল। চারদিকে শুধু আগুন আর আগুন। খালা ভয়ে ছোট বাচ্চাকে কোলে এবং বড় মেয়েকে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যান। কোলের বাচ্চাকে চেপে এবং বড় মেয়েকে নিয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছিলেন। দৌড়াতে দৌড়াতে এক সময় সকাল হয়ে যায় এবং চারদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ে। তখনও হানাদার বাহিনী বোমা মারছে বাঙালির ওপর। চারদিকে যখন আলো ছড়িয়ে গেল তখন সেই আলোয় খালা দেখতে পেলেন যে তার কোলের বাচ্চা তার চাপে মারা গেছে। সেই মরা বাচ্চাকে নিয়ে খালা আল্লাহর কাছে কেঁদে বললেন যে, কী অপরাধ করেছিল এই নিষ্পাপ শিশু? হানাদার বাহিনীর সে আক্রমণ দেখে খালা ধৈর্যহারা হয়ে সেই প্রাণপ্রিয় বাচ্চাকে ফেলে দিয়ে মেয়ের হাত ধরে চলে যায়। যেতে যেতে এক সময় তার ভাইয়ের সাথে দেখা হয়। তখন খালার ভাই, খালা এবং তার নয় বছরের মেয়ে একটি স্কুলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সেখানে খালাদের মতো আরও অসংখ্য লোক ছিল। তারা সবাই ছিল অসহায়। এই কঠিন মুহূর্তে খালার নয় বছরের মেয়ে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে। মেয়ের এ ধরনের কাণ্ড দেখে খালা কিছু ভুট্টা ভেজেছিলেন। সেই ভুট্টা হাতে নিয়েই খালার ভাই খাদ্যের সন্ধানে বের হয়ে গেলেন। যেতে যেতে তিনি একটি রেলওয়ে স্টেশনে এলেন। ঠিক তখনই হানাদার বাহিনী তাকে ধরে নির্মমভাবে হত্যা করে। খালা খবর পেয়েও ভাইকে এক নজর দেখতে পারলেন না।

দীর্ঘ নয় মাস পর তিনি নিজের বাড়ি ফিরে পেয়েছিলেন। তিনি বাড়ি ফিরে আসার সময় দেখেন যে, শত শত মানুষের লাশ পড়ে রয়েছে। পশু-পাখি, কুকুর মানুষের মাংস টেনে খাচ্ছে। তখন খালা চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি কেঁদে বলেন, হে খোদা, এই কি তোমার বিচার। আমার এই সুন্দর পরিবার তুমি এভাবে ভেঙে দিলে।

সূত্র: জ-৭৯৪৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
কামরুন নাহার	**রোকেয়া বিবি**
মোলামগাড়ী হাট দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : মলিকান্দা, থানা : শিবগঞ্জ
৯ম শ্রেণি, রোল : ০২	জেলা : বগুড়া
	বয়স : ৬৮ বছর

অনেক মেয়েকে নিয়ে যায়

১৯৭১ সালে আমাদের দেশে যুদ্ধ শুরু হয়। আমার দাদার কাছ থেকে জেনেছি যে পাকবাহিনী রংপুর থেকে ক্ষেতলাল থানা ও কাজিপাড়ার ভেতর দিয়ে ট্যাংক দিয়ে মোলামগাড়ী হাটের পশু হাসপাতাল ধ্বংস করে দেয়। তারপর ট্যাংক করে শত শত পাকসেনা ক্ষেতলাল থেকে দুপচাচিয়ার দিকে যেতে থাকে। আমলার নিকটে পাকবাহিনীর দুইটি ট্যাংক মুক্তিবাহিনী ধ্বংস করে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে ভারত থেকে একটি বিমান আমাদের মাথার ওপর দিয়ে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট ধ্বংস করে দেয়। আবার বিমানটি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ধ্বংস করে দেয়। তারপর সেটা ভারতে চলে যায়। রংপুর থেকে আসা পাকবাহিনী দুপচাচিয়ায় আত্মসমর্পণ করে।

পাকবাহিনী ছাড়া আমাদের এখানে ছিল শান্তি কমিটির সদস্য মঈন চৌধুরী ও জমির কেরানি। অনেক মানুষকে তারা ধরে নিয়ে যায় পাকসেনাদের ক্যাম্পে। তারপর তাদের গুলি করে মেরে ফেলে। তাছাড়া আমাদের এলাকায় মেয়েদের মধ্যে শিল্পী, সম্পা, রীতি আরো অনেককে নিয়ে যায়। তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এছাড়া ওসমান, মুক্তা, মৌসুমী, রিমা, মারুফা, রোখছানা নির্যাতিত হয়। তাছাড়া আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম

নানাহার থেকে এক লোককে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তিনি পাকবাহিনীর কাছে প্রাণভিক্ষা চান। অনেক কষ্ট দেয়ার পর তাকে ছেড়ে দেয়।

অনেক রক্তের বিনিময়ে আমাদের এদেশ স্বাধীন হয়।

সূত্র: জ-৭৯৬৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মেহেদী হাসান	**মো. আবুল হোসেন**
মোলামগাড়ী হাট দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : মোলামগাড়ী হাট
১০ম শ্রেণি, রোল: ই-৩, ভোকেশানাল	থানা : ক্ষেতলাল, জেলা : জয়পুরহাট
	বয়স : ৭৫ বছর

মাটি দিতে পারলাম না

তখন আমি তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। বাবা-মা আমাকে স্কুলে যেতে দেয় না। স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। মিলিটারি বাহিনী গ্রাম-গঞ্জে, শহরে বাড়িঘর ও দোকানপাটে আগুন ধরিয়ে দিল। মানুষকে হত্যা করতে লাগল। হিন্দুদের ওপর বেশি অত্যাচার চালাতে লাগল। তখন আমাদের গ্রামের সবাই এদেশ ছেড়ে ভারতে রওনা হয়।

ভোর চারটায় আমরা ভারতের উদ্দেশে রওনা হলাম। সকাল দশটায় গোপিনাথপুর পৌঁছলাম। সেখান থেকে আবার যাত্রা শুরু করি। রাত্রি দুইটায় সোনামুখি নদী পার হয়ে দুপুর বারোটায় একটা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিই। দেখতে পেলাম এক বৃদ্ধা মারা গেল। কোদাল না থাকায় তাকে মাটি দিতে পারলাম না। সেখানে এক গর্ভবতী বাচ্চা প্রসব করল এই দৃশ্যও স্মরণীয় হয়ে আছে। তারপর দুপুর দুইটার দিকে রওনা হলাম। মঙ্গলবাড়ি হাটের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম বাড়িঘরগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তখনও সেগুলোর কয়লা লাল হয়ে আছে। মঙ্গলবাড়ি পার হওয়ার সময় মাকে হারিয়ে মাসিমার হাত ধরে চিংগাসপুর বাজার দিয়ে ইন্ডিয়া পার হলাম। তখন সন্ধ্যা, আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম, মাসিমা আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। ইন্ডিয়ার দক্ষিণ নগর এলাকায় রাত্রিযাপন করলাম। পরদিন সকাল দশটায় আমার বাবা-মার সাথে দেখা হয়।

নয় মাস আমরা ইন্ডিয়াতে থাকি। সেখানে টাকা ও চিকিৎসার অভাবে আমার ছোট ভাই মারা যায়। অনেক দুঃখ-ব্যথা নিয়ে নয় মাস কাটিয়ে দিলাম। অনেক রক্ত, অনেক প্রাণের বিনিময়ে আমাদের এ দেশ স্বাধীন হয়েছে।

সূত্র: জ- ৮২৫৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
নিটন কুমার	**নারায়ণ চন্দ্র প্রাং**
পুনট উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : ইমামপুর, পোস্ট : পুনট
৮ম শ্রেণি, রোল : ৯৪	থানা : কালাই, জেলা : জয়পুরহাট
	বয়স : ৭৮, সম্পর্ক : বাবা

এইতো মোক বাঁচাচিল

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় সকল মানুষ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। কেউ কেউ আবার মিথ্যা রাজাকার ইত্যাদি সেজেও দেশের মানুষের সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। তেমনি একজন ব্যক্তি নজরুল ইসলাম। তিনি নওগাঁ থানার কোনো এক গ্রামে বাস করতেন। বর্তমানে তিনি কী করেন আমি জানি না। কিন্তু তিনি যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালিদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন তার একটি কাহিনী তুলে ধরলাম।

তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে থাকতেন এবং তাদের মিছামিছি হয়রানি করাতেন। একদিন পাকবাহিনী তাকে সঙ্গে করে আক্কেলপুর থানার কোনো এক গ্রামে বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধা পান্নাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। সঙ্গে

কিছু খারাপ রাজাকার ছিল, তারা পাকবাহিনীকে বাড়ি দেখিয়ে দেয় এবং নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে পাকসেনারা পান্নার মাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং তার সন্তান এখন কোথায় আছে জানতে চায়। তার মাতার কাছে কোনো প্রশ্নের উত্তর পায় না। তখন পাকসেনারা খুবই রাগান্বিত হয় এবং তার মাকে মেরে ফেলতে চায়। সে সময় নজরুল পাকসেনাদের অনেক বুঝিয়ে-শুনিয়ে বলে তার মার নামাজ পড়া শেষ হোক। পান্নার মা ছিল অত্যন্ত বয়স্ক মহিলা সুতরাং পাকসেনারা তার কথায় আশ্বস্ত হয়ে চলে যায় এবং বলে আমরা যেতে যেতে যেন দেখতে পারি পান্নার ঘরবাড়ি জ্বলছে। পাকসেনারা চলে যাওয়ার মুহূর্তে তিনি পান্নার মাকে বলেন, বুড়ি মা আমি কিছু পানি এনে দিচ্ছি আর কিছু খড়। তখন সে এক কলসি পানি এনে খড়ের কাছে রাখে এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর নজরুল দ্রুত পাকসেনাদের কাছে চলে যায়। আর দূর থেকে পাকসেনারা দেখতে পারে সত্যি সত্যি আগুন ধরিয়ে দিয়েছে নজরুল। তারা খুশি হয়ে নজরুলকে নিয়ে চলে যায়। আর এদিকে পান্নার মা কলসির পানি দিয়ে আগুন নেভায়। এভাবে নজরুলের কারণে পান্নার মার জীবন রক্ষা পায়। নজরুল চলে যাবার পর পান্নার মা নজরুলের দীর্ঘ জীবন কামনা করে আল্লাহর কাছেদোয়া করে ও যেন সুখে-শান্তিতে থাকে সে।

দিন যায়, মাস যায় এবং এক সময় যুদ্ধও শেষ হয়। পাকসেনারা বাঙালিদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ নামে পরিচিত হয় বিশ্বের কাছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তিসেনারা তাদের নিজ উদ্যোগে রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের ধরে আনে। এক সময় মুক্তিযোদ্ধা পান্না নজরুলকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাকে মারার পরিকল্পনা করে নিজ বাসার একটি ঘরে আটক করে রাখে। যখন রাজাকারদের ধরা হয় তখন আশপাশের অনেক মানুষজন আসে তা দেখতে। তেমনি পান্নার মাও দেখতে আসে। তখন পান্নার মা পান্নাকে বলে, বাবা তুই বলে এডা রাজাকারক ধরে আনিছু। চাদিনি মুই এনা ওকি দেখমু এই মুক বাঁচাচিল নাকি।

তখন পান্না বলে তা হবে কেন আমরা ধরে এনেছি সত্যিকারের রাজাকারকে। তার পরেও মার জেদ সইতে না পেরে পান্না তার মাকে নিয়ে যায় এবং পান্নার মা নজরুলকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের কাছে পড়ে যায় আর বলতে থাকে তোরা কাকে ধরে আনিছু বা, এলাতো মানুষ নয়ইবা ফেরেস্তা। এইতো মোক বাঁচাছিল। তখন পান্নার মা উপস্থিত সকলকে সেদিনের ঘটনা বলে এবং তাদের মধ্যে অনেকে অবশ্য জানে যে নজরুল একজন ভালো মানুষ। তখন তারাও সায় দিয়ে বলে হ্যাঁ নজরুল ভালো। সে রাজাকার হলেও কোনো মানুষের ক্ষতি করেনি। তখন পান্না নজরুলকে ছেড়ে দেয় এবং তাকে সম্মানের সাথে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

সূত্র: জ-৮০৪৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
তসলিম আহম্মেদ	**তহমিনা বেগম**
ভাদশা উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক : মা
৬ষ্ঠ শ্রেণি	

পাঞ্জাবিরা গুলি করে লোক মারে

আমার বয়স যখন ২০ বছর তখন যুদ্ধ শুরু হয়। আমি তখন এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হই। পাঞ্জাবিরা ঘুমন্ত অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের পাড়াতে। তাদের গুলির শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি চেয়ে দেখি আমার বাবা বসে কাঁদছেন। সেই রাতে পাঞ্জাবিরা আগুন লাগিয়ে দেয় আমাদের পাড়াতে। তখন সবাই ভয়ে পালাতে থাকে। আমি তখন দরজা খুলে দেখি বহু লাশ পড়ে আছে। আমার সামনে দিয়ে দুই লোক ভয়ে পালাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবির গুলি লেগে মারা যায়। আমি ভয়ে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করি। তখন পাঞ্জাবিরা আমাদের পাড়ার ছয়-সাত জন লোককে ধরে গুলি করে। আমি তখন লুকিয়ে দেখি। তারা আমার চোখের সামনে মারা যায়। আমি তখন ঘরে ঢুকলাম, ঘরে ঢুকে আমার সব বই একটি ব্যাগে ঢুকিয়ে নিই।

সেগুলো মটির নিচে পুঁতে ফেলি। তারপর আমি শুনলাম পাঞ্জাবিরা আমাদের গ্রামের একটি মেয়েকে ধরে ধর্ষণ করেছিল। তারপর আমি আমার বাবা ও মাকে নিয়ে ভারতে চলে যাই। ভারতে যাওয়ার সময় আবার আমাদের সামনে পাঞ্জাবির গুলি লেগে কিছু লোক মারা যায়। তাই দেখে সবাই আরো জোরে ছোটে। কেউ কেউ আবার দৌড়ে পালায়। ভারতে গিয়ে মুরলিপুর গ্রামে থাকতে লাগলাম। দুই-তিন দিন নিজের টাকা খরচ করে খাওয়া-দাওয়া করি। আমাদের টাকা শেষ হয়ে যায়। তখন আমাদের রিলিফের কার্ড করে দিয়েছিল ভারতের কর্মকর্তারা। তারপর আমার সামনে তিনজন লোক অসুখে মারা যায়। ভারতে গিয়ে প্রায় সবলোক রোগে আক্রান্ত হয়। কলেরায় প্রায় ৫০ জন লোক মারা গেল। আমি তখন রিলিফের চাল উঠিয়ে খাওয়া-দাওয়া শুরু করি। সেখানে জল ও পায়খানার অসুবিধা হতো। একদিন আমি কয়েকজন লোক নিয়ে ভারত সরকারের কর্মকর্তাদের বলি। তারা আমাদের একটি টিউবওয়েল ও পায়খানার ব্যবস্থা করে দিল। আমরা সবাই তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

এভাবে থাকতে থাকতে নয় মাস কেটে যায় ভারতে। নয় মাস যুদ্ধ হওয়ার পর হঠাৎ একদিন সকালে আমি শুনতে পেলাম বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আর পাঞ্জাবিরা বাংলাদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তখন থেকে আমরা ১৬ ডিসেম্বরকে বিজয় দিবস বলি। বাংলাদেশিরা যে যেখানে ছিল তারা সবাই ফিরে আসে নিজ দেশে। আমি পরের দিন চলে এলাম। বাংলাদেশে আসার পর আমি আমার নিজ গ্রামে ফিরে যাই। এসে দেখি আমাদের সব বাড়িঘর পুড়িয়ে ছাই বানিয়েছে পাঞ্জাবিরা। সারা রাস্তাতে লাশ পড়ে আছে। আমার বাড়ির নিকটে একটি কালী মন্দির ছিল। সেটা পাঞ্জাবিরা ভাঙেনি বা পোড়ায়নি। সেখানে আমি আবার কিছুদিন থাকলাম। তারপর মুসলমানদের বাড়ি থেকে কিছু চাল-ডাল ও তার সঙ্গে বাঁশও দুই-একটা চেয়ে নেই। তারপর সেই বাঁশগুলো দিয়ে আমি একটি ছোট ঘর করে সেখানে বসবাস করতে থাকি। দেখি আমি যেসব বই-খাতা মাটিতে পুঁতেছিলাম সেগুলো আর নেই। তখন থেকে আমার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। আমি বর্তমানে প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়ে কোনোমতে সংসার চালাই। আমি পরিবার নিয়ে সুখেই আছি। এই হলো আমার জীবনের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা।

সূত্র: জ-৮০৬৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শিপন চন্দ্র বর্মণ	**অনিল চন্দ্র ঘোষ**
ভাদশা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : ঘোষপাড়া, থানা : জয়পুরহাট
৮ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ১২	জেলা : জয়পুরহাট
	বয়স : ৫৫ বছর

কাঁথা-বালিশ দিয়ে ঢেকে রাখে

আমাদের গ্রামের নাম পার্বতীপুর। ১৯৭১ সালে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। কোনো একদিন আমাদের গ্রামে তাঁতিরা আসে। আমাদের এলাকায় কয়েকটি হিন্দু পরিবার বসবাস করত। হিন্দু লোকদের মারার জন্য পাঞ্জাবিদের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের ডেকে আনা হয়। একদিন দুপুর বেলা মিলিটারি আমাদের গ্রামের একটি রাস্তায় এসে দলে দলে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের পাড়ায় একদল মিলিটারি একজনের বাড়িতে ঢুকে বাড়িওয়ালার ভগ্নিপতির হাত থেকে কেড়ে নেয় কলম এবং তার কিছু টাকা নিয়ে চলে যায় পশ্চিম দিকে। একজন লোক তখন কুশারে (আখ) জমি নিংড়ে দিচ্ছে। সেখানে মিলিটারি গিয়ে তাকে ধরে বলে যে সে হিন্দু না মুসলমান। সে বলল, আমি মুসলমান। তবু তারা বিশ্বাস না করে তাকে উলঙ্গ করে দেখে দেখে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় এক হিন্দুর বাড়ি।

এই হিন্দুরা ছিল চৌধুরী বংশের লোক। সেই বাড়ির মালিক গোসল করে খাবার খেতে বসেছে। এই সময় তারা তার সামনে গিয়ে হাজির হয়। তাদেরকে দেখে লোকটির জীবন মনে হয় যেন বেরিয়ে যাচ্ছিল। লোকটি তাদের বলল, আমাকে মারবেন না। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তারা খাবারের প্লেট বন্দুক দিয়ে ঠেলে দেয়। তাকে একটি গাছের তলায় রেখে গুলি করলে তিনি মারা যান। তখন তার স্ত্রী বাড়ি হতে কিছু দূরের একটি পুকুরে গোসল করতে গিয়েছিল। তার স্ত্রী গুলির আওয়াজ শুনে বাড়িতে না ঢুকে পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। লোকটিকে মেরে পাশের বাড়ির দুইজন মুসলমান লোককে ডেকে এনে তারা তার বাড়ির দেয়ালের সামনে মাটি খুঁড়ে পুঁতে রাখে।

তারপর মিলিটারি চলে যায়। যে বাড়িতে লোকটির স্ত্রী আশ্রয় নেন সেই বাড়িতে যাওয়ামাত্র সেই বাড়ির পুরুষ লোকটি পালিয়ে যায়। বাড়িতে ছিল এক মহিলা। মিলিটারিদের বাড়ির দিকে আসতে দেখে মহিলাটি ভয় পেয়ে যায়। তিনি মনে মনে ভাবেন যে, আমাদের বাড়িতে হিন্দু মহিলা আছে তারা জানতে পেলে আমাকেসহ মহিলাটিকেও মারবে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে মহিলাকে কাঁথা বালিশ দিয়ে ঢেকে রাখে। মিলিটারি এই বাড়ি এসে গাছে পাকা আম দেখে অনেকগুলো আম পেড়ে অর্ধেক খেয়ে অর্ধেকটা নষ্ট করে চলে গেল বাড়ির পেছনের রাস্তায়। রাস্তাটির ব্রিজের সামনে গিয়ে তারা দুইজন যুবতী মহিলাকে দেখতে পায়। তারা মহিলাদের ধরে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর তাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যায় ক্যাম্পের দিকে।

তখন ১৯-২০ বছরের এক যুবক বাড়ি থেকে বাজারে যাচ্ছিল। ছেলেটির বাবা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের দলের লোক। আমাদের গ্রামের বক্কর নামের এক লোক ছেলেটিকে ধরিয়ে দেয়। তারপর তারা ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে গাছে টাঙিয়ে বন্দুক দিয়ে মারপিট করে এবং গায়ে বিভিন্ন জায়গায় কেটে লেবুর রস লাগিয়ে দেয়। তখন ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে যায়। তারা মনে করেছিল যে সে মারা গেছে। এই ভেবে তারা ছেলেটিকে ফেলে দেয়। কিন্তু পরে ছেলেটির হুঁশ ফিরে এলে বাড়িতে আসে এবং চিকিৎসা করে। একইভাবে তারা অনেক মানুষ মেরেছিল এবং অনেক মা-বোনের ইজ্জত কেড়ে নিয়েছিল।

সূত্র: জ-৮০৮৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. রায়হান কবির	**তাজির উদ্দিন মণ্ডল**
ভাদশা উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৫৫ বছর, সম্পর্ক : বড় আব্বা
৮ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ১৪	

কাঁধে বন্দুক নিয়ে গ্রাম টহল দিচ্ছে

১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় আমি খুব ছোট ছিলাম। আমার মা-বাবারা ওই মুহূর্তে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন। প্রায়ই বাবা-কাকা, মা সবাই মিলে বলতেন যে, এখন আমরা কোথায় যাব! কখন যে হানাদার বাহিনী এসে আমাদের হত্যা করবে! ঠিক সেই সময় বাবা বলল যে, আমাদের আর ভয় নাই, কারণ আমার জ্যাঠাতো ভাই মুক্তিবাহিনী গঠন করে কাঁধে বন্দুক নিয়ে গ্রাম টহল দিচ্ছে। ওই সময় ছিল কার্তিক মাস। ওই দিন রাত্রে বাবা বলল যে, আর রক্ষা নাই। চারদিকে গোলাগুলির আওয়াজ। ঘুম থেকে সকালে উঠে দেখি বাবা আমাদের বাড়ির জাঁতা, পাটা, থালাবাসন মাটির নিচে পুঁতে রাখছেন। বেলা প্রায় এগারোটার সময় গ্রামের কিছু মুসলমান এসে আমার মাকে বলল, দাদা কোথায় গেছে? মা বলল, পাশের গ্রামে। তখন মাকে বলে গেল দাদা আসামাত্র যেন আমাদের সঙ্গে দেখা করে। বাবা বিকালে তাদের সঙ্গে দেখা করে এসে মা দাদুদেরকে বলেন যে, বাবা আর থাকা যাবে না, কারণ দেশের অবস্থা খুব খারাপ। পরের দিন কে বা কারা নদীর পাড়ে বোমা ফাটিয়ে বিকট শব্দ শোনায়। আর কিছু লোক বলে তোমাদের আর বাঁচানো যাবে না, তোমরা পালাও। গরু-বাছুর সব ছামেদ আলী নামে লোককে জমা দিয়ে ভারতে যাবার সিদ্ধান্ত নিই।

পরের দিন মা, দিদি, আমার ছোট ভাই ও আমি সকাল আটটায় রওনা দিই। সেই সময় মা প্যারালাইসিসের রোগী। এক পা এক হাত অবশ। মা-দিদির পিছে পিছে আমি হেঁটে হেঁটে যেতে লাগলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি

রাস্তায় আমাদের মতো বহু লোক পোটলা-পুঁটলি নিয়ে পালাচ্ছে। ইতোমধ্যে রাস্তায় যাবার পর কিছু পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা পাই। আমার মা খোঁড়া যার জন্য আমাদের ছেড়ে সকলে চলে গেল। সেইদিনের পর বাবা, কাকি, পরিবারের অন্যদের সঙ্গে আর আমাদের দেখা নেই।

তখন মা, দিদি আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল ঘুপসীর বিল পার হয়ে পলাশবাড়ীতে। তখন ঠিক দুপুর বেলা। সেখানে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি। জল, ভাত চাই। তখন একটি বাঁশঝাড়ের নিকট মা বসতে বলে। একটু বিশ্রাম নিয়ে আর আমার ইচ্ছে হয় না উঠে যাই। সেই মুহূর্তে পাশের বাড়ির লোক আসে। বলল যে, তোমরা ভাত খাবে? তখন দিদি ও আমি ভাত চাই। উনারা জাতিতে কী তা জানি না। সেই দিন দুপুর খেসারির ডাল, ভাত ও আলু ভাজি খাই। খাওয়ার পর আবার ধামুরহাটের পশ্চিম পাশ দিয়ে রওনা দিই। ঠিক সন্ধ্যা বেলা কারমী পাড় এক বড়লোকের বাড়ির পাশে ঘোরাঘুরি করি। একজন লোক এসে মাকে বলল, আপনি আমার বোনের মতো, মনে কিছু না নিলে এখানে থেকে কাল চলে যাবেন। এখানে পরে আপনাদের বিপদ হবে।

ওই দিন রাত্রে চৌধুরীর একটি বৈঠক ঘর আমাদেরকে ছেড়ে দিল। রাত্রে হাঁড়ি পাতিল রান্না করার জন্য দিয়ে গেল। মা দিদি রান্না করে। খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার পরের দিন রওনা দিলাম। এ পর্যন্ত বাবার কোনো খোঁজ নেই। আমাদের কেউ খোঁজখবর রাখেনি। পরের দিন হাঁটতে হাঁটতে পিপাসা লাগল। মাকে বলি, জল খাব। মা বলে, জল নেই। দিদি বলে, একটু সামনে গেলে পাওয়া যাবে। এই বলতে বলতে কিছুদূর গেলাম। গিয়ে বললাম আমি আর হাঁটতে পারব না। দিদি তখন আমাকে পিঠে করে নিয়ে গেল। তার অল্প কিছু পর সামনে দেখি বাবা পাগলের মতো কাছে এসে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। মা দুঃখের সাথে বাবাকে বলল যে, সবাই আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। সামনে দেখি একটি ছোট ডোবা। বাবাকে বললাম, জল খাবো। বাবা তখন ওই ডোবা থেকে হাতের তালুতে দিয়ে জল এনে আমাকে খাওয়ায়।

আমরা রাস্তা চিনতাম না। বাবা আসার পর আমাদের রাস্তা আগাতে লাগল। সন্ধ্যার কিছু আগে তিওড় নামক জায়গায় পৌঁছে যাই। গিয়ে দেখি পিসিমা ও অন্য শরীকের লোকজন সবাই পৌঁছে গেছে। এখন আমরা ভারতে। বাবার মুখে দাড়ি ছিল। ওখানে চার-পাঁচ দিন যেতে না যেতে বাবাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গেল। কেন নিয়ে গেল জানি না, আবার ছেড়ে দিয়ে গেল। ওই সময় ভারত সরকার আমাদের জায়গা দিল। বালুঘাট পাওয়ার হাউজে। আমরা সেখানে রিলিফের চাল-ডাল সব কিছুই পেতাম। আমাদের দিন যাচ্ছিল ভালো। আমি ছোট ছিলাম। শুধু কাচের গুটি খেলতাম আর বিকাল বেলা রাস্তার ধারে এসে দেখতাম ট্যাংক বহর। এ সময় আমার দাদা সৈয়দ নামে এক মেজরকে ধর্মভাই করার পরে আমাদের রিলিফের জন্য বেশি লাইনে থাকতে হয় না। ভারতে গিয়ে আমি প্রতিদিন দুধ নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াই।

প্রায় দিন আমাদেরকে মাটির নিচে বাংকার খুঁড়ে ঘরের মতো করে রাখে। আমি বলি, বাবা এখানে কী হবে। বাবা বলে, এখানে সবাই রাতে থাকব। ঠিক কয়েকদিন পর মুখে মুখে শেল পড়ার গল্প শুনি। সেই দিন সবাই বাংকারে ঢুকে গেলাম। কিছু পর বিকট শব্দ আর কান্নার রোল পড়ে গেল। সকালে দলে দলে লোক যাচ্ছে, আমিও গেলাম। দেখি সৈন্যরা মাটি খুঁড়ছে। তখন দেখি শিরলজাতীয় সামনে চোখা পাথরের মতো বের করতেছে। আমি ছোট ছিলাম, কিছু বুঝি না। বেশ কিছুদিন পর বাবা বলল, এখন আমাদের বাড়িতে যেতে হবে। সব ফাঁকা, তখন শীতের সময় ছিল। বাবা সবাইকে বলল জিনিস গোছাইয়া নাও। আমরা সাত দিনের মধ্য চলে যাব। তারপর দেখি দাদা মা আগে চলে এসেছে। পরের দিন আমাদের গ্রামের শফি দেওয়ান একটি গরুর গাড়ি নিয়ে বালুঘাট পাওয়ার হাউসে যায়। রাত থেকে পরের দিন ওই গাড়িতে চড়ে আমি, দাদু, কর্তামা চলে আসি। আসতে আসতে রাত হয়। শফি দেওয়ানের বাড়িতে রাতে চিড়া-গুড় খেতে দেয়া হয়।

পরের দিন হেঁটে বাড়িতে এসে দেখি আমাদের সব ঘর পুড়ে গেছে। বাবার শোবার ঘরে পাঞ্জাবিরা ছিল। ওই ঘরে মাকে দেখি ভাত খাচ্ছে। আমি যেতেই মা চিৎকার করে বলে, আয় বাবা ভাত রাঁধছি। তখন দেখি গোটা বাড়ি মিষ্টি লাউয়ের গাছে ভরা।

সূত্র: জ-৮০৯৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী

সুশান্ত মণ্ডল
ভাদশা উচ্চ বিদ্যালয়
৮ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল : ৩৮

নীরেন্দ্রনাথ অধিকারী
বয়স : ৪৬ বছর

আতঙ্কিত হয়ে দুজনই দে ছুট

নারায়ণ বাবুর নিকট মুক্তিযুদ্ধের করুণ ঘটনাবলি শুনতে বেশ অবাক লাগে। তিনি তাঁর জীবনের বাস্তব ঘটনাবলি তুলে ধরেন। তখন তিনি চোখের জল সামলাতে পারেন না। শ্রদ্ধেয় স্যারের নিকট থেকে পাওয়া ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝির ঘটনা– তখন স্যার ছিলেন কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী। কিন্তু রাজনৈতিক জটিলতায় দেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য হরতালের কারণে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। সামরিক জান্তার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কারণে প্রাণের ভয়ে অনেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। স্যারের পরিবারের সকল সদস্য ও অন্য আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী ইতোমধ্যে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু জন্মভূমির টান ও স্বাধীনতার উন্মাদ নেশায় তিনি সেখানে স্থির থাকতে পারছেন না। তাই বাবা-মার অলক্ষ্যে প্রায় ১০ দিন পরে সীমান্তের পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখার জন্য একদিন বেলা দশটায় সীমান্তের নিকট হাজির হলেন। সেখানে তিনি তার প্রতিবেশী এক ডানপিটে ছেলে বিনয় ঠাকুরের প্ররোচনায় ভারতীয় সীমান্ত পেরিয়ে জয়বাংলাতে প্রবেশ করেন ও জন্মস্থানের উদ্দেশে রওনা হলেন। দীর্ঘ চার ঘণ্টা হাঁটার পরে স্যার নিজস্ব গ্রাম পাইকরদাঁড়িতে পৌঁছেন। বাস্তুভিটার ধ্বংস কাঠামো দেখে নিজের শোকাতুর মনকে সামলিয়ে নিলেন মুহূর্তের মধ্যে। এদিকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় তিনি পার্শ্ববর্তী বোনের বাড়িতে গেলেন। আ. জব্বারের স্ত্রী আলেয়া স্যারের বোন। তিনি সেখানে যেতেই আলেয়া ভাইয়ের পরিস্থিতি বুঝে তাকে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করলেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন রাজাকার স্যারের আগমনের খবর পেয়ে আ. জব্বারকে চাপ দেয় যে কেন সে একজন হিন্দুকে তার বাড়িতে স্থান দিয়েছে।

এক পর্যায়ে স্যারের অনুসন্ধানে একেবারে খাবারের জায়গাতে এসে হাজির হলো। ততক্ষণে দিদি স্যারকে খেতে জেদ ধরতেই তারা চারজন একেবারে স্যারের সামনে হাজির। সঙ্গে পরিচিত জহুরুল বিহারি। ওদেরকে দেখেই স্যারের আত্মা একেবারে খাঁচাছাড়া। ওদের মধ্যে একজনের স্যারের প্রতি দয়া হলো। সে তাকে ইশারা করে পালাতে বলল। ওরা সামনে বারান্দায় বসার আয়োজন ও প্রস্তুতি নিতেই ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে স্যার নিকটে এক গর্তে পানিতে ডুবে রইলেন। শুধু নাকের ছিদ্র দিয়ে কোনোমতে পানির ওপরে ভেসে নিশ্বাস চালালেন। এদিকে ওরা খুব খোঁজাখুঁজি করে সন্ধ্যার দিকে চলে যাওয়ামাত্র স্যার সেখান থেকে উঠে সবার অলক্ষ্যে সীমান্তের দিকে রওনা হলেন। প্রায় ৬ মাইল দূরে যাওয়ার পরে মঙ্গলবাড়ি বাজারের অদূরে জীবন বাজি রেখে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে আরেকজন সঙ্গীর সাক্ষাৎ পেলেন। সেই সঙ্গী স্যারের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। বাড়ি নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার কীর্তিপুর গ্রামে। বয়স প্রায় ১৯ বছর। বাবা-মার তিন সন্তানের একমাত্র পুত্র এবং অপর দুইজন বোন। নাম দীজেন্দ্রনাথ সরকার।

তার নিকট থেকে স্যার জানতে পারলেন যে, শরণার্থীর এক কাফেলা নাকি পাকহানাদারদের হাতে ধরা পড়েছে। তাদের মধ্যে তার পরিবারের একজন সদস্য আছে বলে তিনি শুনেছেন। তাই দীজা ওর জীবন রক্ষার্থে প্রাণপণে বৃথা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ঠিক করলেন যে সামনে বাজারে হানাদারদের নিকট নিজেই যাবেন। কিন্তু কিছুতেই তাকে প্রবোধ মানানো যাচ্ছে না। তিনি স্যারকে বললেন, বিয়াই তুমি একটু অপেক্ষা করো আমি সামনে দূর থেকে একটু পরিস্থিতি বুঝে আসি– এই বলে সে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই ভাগ্যের নির্মম পরিহাস কয়েকজন হানাদার তাকে তৎক্ষণাৎ ঘিরে ফেলল। স্যার হামাগুড়ি দিয়ে একটু একটু করে দূর থেকে জ্যোৎস্নার আলোতে দেখার চেষ্টা করলেন। ততক্ষণে দীজা ওদের নাগালে আবদ্ধ অবস্থায় চিৎকার করে বললেন, বিয়াই পালিয়ে যাও তাড়াতাড়ি। প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে শোনা গেল গুলি ব্রাশ ফায়ার।

পরের দিন খবর পাওয়া গেল প্রায় দেড়শ শরণার্থীর কাফেলা একবারে নিঃশেষ করে দিয়েছে। দীজা বিয়াই আর নেই। অনেকক্ষণ পরে স্যার দূর দিয়ে চুপিসারে মাঠের ভেতর দিয়ে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলেন। মাঝ মাঠে আবার এক ব্যক্তির সাথে স্যারের সাক্ষাৎ হয়। সে পাগলা দেওয়ান নামক বর্ডারের হাট থেকে ফিরছিল। সে স্যারকে সামনে পেয়ে আশা করল স্যারের নিকট না জানি কত টাকা পয়সা ও সোনাদানা আছে। তাই সে স্যারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। এক পর্যায়ে স্যারকে সে জোরপূর্বক তার সামনে এগোতে বলল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্যার অসহায় অবস্থায় ঠিক তাই করলেন। আর ওই ব্যক্তি স্যারের পেছন অনুসরণ করে নির্দেশমতে পাড়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর স্যারের মনে দৃঢ়তার সঞ্চার হলো। তিনি মনে মনে স্থির করলেন, জীবন তো দিতেই হবে তবে এইভাবে কাপুরুষের মতো জীবন দেয়া ঠিক হবে না, বরং সংগ্রাম করে জীবন দিলে আত্মা স্বর্গলাভ করবে। তাই তিনি সজোরে একটা হুংকার ছেড়ে বললেন, মরতে তো হবেই তবে তোর মতো ইতরের হাতে নয়। তোকে একবার উচিত শিক্ষা দিয়েই মরব। এই বলে তিনি ইতরের সামনে থেকে সজোরে ঘুরে ওকে সামনে নিয়ে পেছনে সজোরে ছুটলেন। আর এদিকে ওই ইতর মনে করল হয়তো সে তাকে আক্রমণ করার জন্য পিছু অবস্থান নিয়েছে। এই মনে করে সে সামনে সজোরে দে ছুট। ওর পায়ে ধানের গোড়ার শব্দে ভাবছে কেউ পেছনে ছুটছে। ভয়ে সে বিকট চিৎকার করে উঠল এবং ধুম করে মাটিতে পড়ে গেল। স্যারও উল্টো দিকে ছুটছিলেন, উভয়েই আতঙ্কিত। স্যার নিজ গতি না থামিয়ে একেবারে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের মিশালা গ্রামে সীমান্তসংলগ্ন আত্মীয়র বাড়িতে উপস্থিত হলেন। রাত এগারোটার সময় বাবা-মা স্যারের সাক্ষাৎ পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, কিসের জন্য তুমি এই বিপদের মুখে গিয়েছিলে? আর কোনোদিন এমন ভুল করো না। পরের দিন সকালে শুনলেন মঙ্গলবাড়িতে অনেক শরণার্থীকে হানাদাররা গুলি করে মেরেছে এবং পাগলা দেওয়ান মাঠে এক লোক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

সূত্র: জ-৮১০৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মিন্টু কুমার কর্মকার	**নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডল**
ভাদশা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : দুর্গাদহ বাজার
৮ম শ্রেণি, রোল : ৪	জেলা : জয়পুরহাট

মাটিতে পড়ে গেল

১৯৭১ সাল। এক একটি দিন ছিল ভয়াবহ। পাকিস্তানিরা তখন নানাভাবে বাঙালিদের অত্যাচার করত। আমার দাদু দেখেছেন, যে কাউকে তখন খান সেনারা গুলি করে মেরে ফেলত। কারো ঘরে আগুন লাগিয়ে দিত। আর মেয়েদের ওপর নির্মম অত্যাচার করত। সেই দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে আমার দাদুর চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগল। দাদু বলেছেন যে, তখন মানুষের অভাবের শেষ ছিল না। অভাব অনটনের মধ্যে মানুষকে কষ্টে জীবনযাপন করতে হয়েছে। আমার দাদুর বয়স ছিল তখন ৫৫ বছর। ১৯৭১ সালের কোনো এক বুধবারে পাকিস্তানিরা এসে বদলগাছি থানায় হাজির হয়। হিন্দুরা তা জানতে পেরে আগেই ভারতে পালিয়ে যায়। বেলা যখন দুপুর তখন আমার দাদু লুকিয়ে দেখতে পেল যে, হানাদার বাহিনী একজনকে পেছন দিক থেকে ছুরি মেরেছে। লোকটি তখন মারা যাওয়ার মতো মাটিতে শুয়ে পড়ল। হানাদার দল যখন সেনপাড়া গ্রামের ভেতরে ঢুকল তখন লোকটি নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সেখান থেকে পালিয়ে গেল এবং এক মাইল দূরে হিন্দু পাড়ায় এসে মাটিতে পড়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে আমার দাদু আর পাড়ার সমস্ত লোক উত্তর দিকে পালিয়ে যায়। সবাই এক পুকুরের পাশে একটি জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে পড়ল। যখন হানাদারদের দেখা গেল না তখন সবাই বের হয়ে রাতের অন্ধকারে পথ চলতে লাগল। এভাবেই কেটে গেল সারারাত। ভোরবেলা আমার দাদু ও আরও লোকেরা বর্ডার পার হলো। তার পরের দিন কে কোথায় নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য চলে গেল, তাদের সাথে দাদুর আর দেখা

হলো না। আমার দাদু তখন দাদিকে ও তার দুই ছেলেকে নিয়ে ভারতের মানিকো গ্রামে চলে যায়। সেখানে গিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিল। তাদেরও খুব অভাবের সংসার ছিল। তাদের বাড়ির আশপাশে দাদুকে থাকার জন্য একটি কুঁড়েঘর তৈরি করে দিল। ভারতের ইন্দিরা গান্ধী তখন বাঙালিদের সব ঘটনা জানতে পারল। তখন খাদ্য সামগ্রী দিতে লাগল। তারপর নয় মাস ধরে যুদ্ধ হওয়ার পর বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। তারপর দাদু আবার বাংলাদেশে ফিরে এলো। বাংলাদেশে এসে দাদু দেখল যে, সারা বাংলাদেশে শুধু আমাদের লাল ও সবুজের মুক্ত স্বাধীন পতাকা উড়ছে। দাদু এই বলে তার প্রিয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা শেষ করল।

সূত্র; জ-৮১১৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সাথী তির্কী	**নরেন্দ্রনাথ সরদার**
ভাদশা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : মাধবপাড়া, জেলা : নওগাঁ
৮ম শ্রেণি, রোল : ০১	সম্পর্ক : দাদু

মনে করতে চাই না

১৯৭১ সালের সেই কথা আর মনে করতে চাই না। কারণ বুকফাটা আর্তনাদে মন ভেঙে যায়। তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি। আমার বাবা ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। লোকে আমার বাবাকে আফজাল মাস্টার বলেই চেনে। আমরা রেডিওতে জানতে পারি আমাদের জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তখন আমাদের পূর্বপাড়ার কিছু লোক স্বাধীনতাবিরোধী ছিল। তারা ছিল রাজাকার। আমাদের মধ্যপাড়ার লোকেরা তাদেরকে বিশ্বাস করে না। তারা পাকহানাদার বাহিনীর হাতে হাজার হাজার মানুষকে ধরিয়ে দিয়েছে। পাকবাহিনী নিরীহ নিরপরাধ মানুষগুলোকে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারে।

একদিন বিকেলে পাকবাহিনী আমাদের গ্রামে আসে। রাজাকার, আলবদর, আলশামস আমাদের পাড়ার অনেক মানুষকে ধরিয়ে দেয়। রাজাকাররা আমাদের সাথে প্রায়ই ঝগড়া করত। আমাদের হেয় চোখে দেখত। সেই দিন বিকেলে পাকহানাদার বাহিনী রাজাকারদের নিয়ে অনেক মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের গ্রামে তখন কান্নার রোল পড়ে গেল। আর কয়েকবাড়ি পর আমাদের বাড়িতে পাকবাহিনী এসে পৌঁছায়। আমরা তখন বাড়ির দরজায় খিল দিয়ে সবাই ভীত হয়ে বসে আছি। তখন রাত একটু গভীর হতে লাগল। কিছুক্ষণ পর আমাদের দরজায় এসে করাঘাত করতে থাকে। আমরা ভয়ে সবাই কাঁপতে শুরু করলাম। আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা চারজন। মাস্টার মানুষ তো, ভয় না করে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বাইরে থেকে পাকবাহিনী দরজাতে লাথি মারতে শুরু করল। আর বলতেছে বাড়িওয়ালাকো, দরজা নেহি খুলতি হায়। রাজাকাররা বলতেছে, দরজায় লাথি মেরে ভেঙে ফেলুন স্যার। যখন আমার বাবা দরজা খুলে দিলেন তখন আমার বাবাকে শার্টের কলার ধরল পাকবাহিনীর এক সদস্য। আমরা তখন হতভম্ব হয়ে পড়লাম। আমার বাবাকে মারছে দেখে আমার মা ছুটে গেলেন। তখন আমরা পালাবার চেষ্টা করলাম, মুহূর্তের মধ্যে আমার বাবাকে গুলি করে মেরে ফেলা হলো। তখন আমার মা চিৎকার করতে লাগল। আমার মাকেও তারা গুলি করে হত্যা করল। তখন আমরা দুই ভাই-বোন মিলে পায়খানার মধ্যে লুকিয়ে থাকলাম। তারপর তারা আমাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারপর তারা চলে যায়। আমাদের গ্রামের অনেক মেয়েকে তারা অপহরণ করে। কেউ আত্মহত্যা করে। সেই করুণ কাহিনী আর বলার মতো না। তখন আমরা দুই ভাই-বোন মিলে আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে গেলাম। কিছুদিন পর আমার আদরের ছোট বোনটি বাবা-মার শোকে মারা গেল।

সূত্র: জ-৮১১৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. নাজমুল হোসাইন	**মো. আজির উদ্দিন**
ভাদশা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : তুপাড়া

৯ম শ্রেণি, বিজ্ঞান শাখা, রোল : ১১ বয়স : ৬৫ বছর

নতুনভাবে সংসার পাতলেন সুরবালা

আমি যার সাক্ষাৎকার নিলাম তিনি ১৯৭১ সালে ছিলেন একজন সাধারণ গৃহিণী। জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার একটি ছায়াঘেরা গ্রাম কোচকুড়ি। এই কোচকুড়ি গ্রামের আর দশটা পরিবারের মতো জ্ঞানদানন্দ ও সুরবালার সংসার। সুরবালা ছিল অশিক্ষিত এক সাধারণ নারী। সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তিনি। একদিন তিনি শুনতে পেলেন যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালির ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। শুনেও তিনি তেমন গুরুত্ব দেননি। দুই দিন বাদে দুপুরের দিকে ভাত রান্না করতে করতে সংবাদ পেলেন যে আশপাশের গ্রাম হতে সকল হিন্দু ভারতে চলে যাচ্ছে। কারণ হিন্দুদের ওপর পাকিস্তানিদের আক্রোশ ছিল বেশি। ভাতের পাতিল চুলোর ওপর রেখেই সুরবালা তার দেড় বছরের ছোট ছেলেটাকে খুঁজতে গিয়ে সংবাদ পান যে, তার স্বামী অন্য দুই ছেলে ও দুই মেয়েকে নিয়ে কিছু জিনিসপত্রসহ আগেই চলে গেছেন। তিনি আর কী করেন। কাঁদতে কাঁদতে ছোট ছেলেকে এবং একটা চালের চাঙারি ও একটি এক কেজি লবণের প্যাকেট নিয়ে গ্রামের অন্য লোকের সাথে অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমালেন। কিছুদূর গেলে তুপাড়া নামক স্থানে কয়েকটি লোক সেই হতভাগ্য কাফেলাদের সব কিছু কেড়ে নেয়, সুরবালা কিন্তু তার লবণের প্যাকেটটা রক্ষা করেছিল। তারা আরও কিছুদূর যাওয়ার পর হরিপুরের ঘাটে গিয়ে থামেন এবং একটি লোক গ্রামে ফিরে আসে খোঁজ নেওয়ার জন্য। লোকটি এসে দেখে পণ্ডিতপুর ও উত্তর কোচকুড়ির কিছু লোক তাদের কিছুক্ষণ আগে ফেলে যাওয়া সমস্ত জিনিস ভাগ করে নিচ্ছে।

যাই হোক, এভাবে চলার পর তারা একদিন পর ভারতের সীমান্তে পৌঁছায়। সুরবালা যে জায়গায় পৌঁছে সে জায়গার নাম চেঙ্গিসপুর। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মধ্যে চেঙ্গিসপুরে কোনো ভারতবাসীর দেওয়া সামান্য ভাত খেয়ে সুরবালা তার ছোট ছেলেটাকে নিয়ে গাছতলায় একটি রাত কাটায়। পরদিন সুরবালা অন্য লোকের সাথে তিত্তর হাটে পৌঁছায়। সেখানে বিনা আশ্রয়ে অনাহারে কিছুদিন কাটানোর পর সন্তান ও স্বামীর খোঁজ পায়। স্বামীর খোঁজ পেলেও স্বামীকে সেই মুহূর্তে দেখতে পেলেন না সুরবালা। কারণ তার স্বামী ছেলেমেয়েদের নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে সুরবালাকে নিতে আবার বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন। তার মনটা তখন ব্যথায় ছটফট করছিল। সুরবালার স্বামী গ্রামে ফিরে আসার পর গ্রামের ইসহাক ডাক্তার তাকে আশ্রয় দেন। ৯ মাস যুদ্ধ চলার পর দেশ স্বাধীন হলে সুরবালা গ্রামে ফিরে এসে দেখেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তার ছোট সংসারকে তছনছ করে দিয়েছে। তার যত্নের বাড়িটির কোনো চিহ্ন নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে কচুর ঘন ঝোপ। তার স্বামী সেই অবস্থায় ভেঙে পড়লেও সাহস জুগিয়েছেন এই গ্রাম্য নারী। আবার ঘর বাঁধলেন, নতুন সংসার পাতলেন সুরবালা। দুঃখের দিনটুকু তার জীবন থেকে সরে গেলেও সুরবালার মন থেকে মুছে যায়নি সেই ভয়ংকর দুঃখের স্মৃতি। সেই কাহিনী বলতে গেলে এখনও সুরবালার চোখ ভরে ওঠে জলে।

সূত্র; জ-৮১৩৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
রিমু রানী মণ্ডল	**সুরবালা দেব্যা**
ভাদশা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : কোচকুড়ি, পোস্ট : জয় পার্বতীপুর
৭ম শ্রেণি	জেলা : জয়পুরহাট, বয়স : ৬৭ বছর

দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া মুক্ত করি

আমি তিন মাসের ট্রেনিং শেষ করে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করি। হিলির যুদ্ধে অনেক মিত্রবাহিনীর সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। কারণ হিলি ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর বড় ঘাঁটি। পরে আমরা

দিনাজপুরের সমজিয়া বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং দিনাজপুর রংপুর মুক্ত করি। পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর বাংকার হতে বহু মেয়েকে জীবিত ও মৃত উদ্ধার করি। তাদের পরনে কোনো কাপড় ছিল না। মুক্তিযোদ্ধাদের গায়ের জামা-লুঙ্গি তাদের পরতে দিতে হয়েছিল। বগুড়া পৌঁছার আগে কাটাখালি ব্রিজ পাকবাহিনী ভেঙে দেয়। তখন পারাপারে খুব কষ্ট হয়। ব্রিজের চারদিকে মাইন পুঁতে রাখা হয়। সে সমস্ত অপসারণ করতে বহু মিত্রবাহিনীর সৈন্য সেখানে মারা যায়। হেঁটে বগুড়া পৌঁছাতে আমাদের খুব কষ্ট হয়। কারণ সঙ্গে কোনো প্রকার খাবার ছিল না। চারদিন না খেয়ে বগুড়াতে গিয়ে গ্রামের লোকদের নিকট থেকে ভাত চেয়ে একজনের খাবার চারজন খেয়েছি। তাতে কোনো প্রকার তরকারি ছিল না। ১২ ডিসেম্বর হতে বগুড়ায় যুদ্ধ শুরু হয়। ১৩ ডিসেম্বর আমার পেটে গুলি লাগে, আর জলিল নামে আমার সহযোদ্ধা মারা যায়। ১৪ ডিসেম্বর বগুড়া মুক্ত হয়। আমার সঙ্গে ছিল আমার বন্ধু মাহবুব আলম রেন্টু। শরীরে গুলি লাগায় আমার রক্ত বন্ধ হয় না। কোনো প্রকার ওষুধ ছিল না। ওই সময় গ্রামের ইয়াসিন ডাক্তার নামে এক লোক আমাকে দেখে কি যেন ওষুধ খাওয়ালেন আর বললেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কিছু বলা যাবে না। তারপর ওইখান থেকে আমাকে ভারতের সৈন্যরা রংপুরের গোবিন্দগঞ্জ হাই স্কুলে তাদের ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করে। আমার সহযোদ্ধারা কেউ বলতে পারে না আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারা জানে আমি মারা গেছি। কিন্তু আমি এখনো বেঁচে আছি। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা।

সূত্র; জ-৭৮২১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. সামিম রেজা	**মো. ছাত্তার**
গোপীনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক : চাচা
৬ষ্ঠ শ্রেণি, রোল : ১৭	

চাচাতো ভাই বলল 'জয় বাংলা'

১৯৭১ সাল। খালুর বয়স তখন ১১ বছর। মিলিটারি ঢাকা থেকে ট্রেনযোগে জামালগঞ্জ পৌঁছায় কয়লার ইঞ্জিন নিয়ে। তারপর মিলিটারিরা ২০-৩০ জন ব্যক্তিকে লাগিয়ে দেয় ইঞ্জিনে পানি দেওয়ার জন্য। মিলিটারির মেজর সেখান থেকে জামালগঞ্জ বাজারের ভেতর চলে যায় এবং সেখানে পাবলিকদের লাগিয়ে দেয় বাজার লুট করতে। তখন আমি, আমার এক চাচা ও চাচাতো ভাই দেখতে গেলাম। আমার চাচা ও চাচাতো ভাইকে দুই গালে চড় দিয়ে ইঞ্জিনে তোলে এবং আরও ২০-২৫ জন সহকারে সারিবদ্ধভাবে লাইন করে গুলি করে হত্যা করার জন্য। যখন তাদের রাইফেল ধরে গুলি করার জন্য এমন সময় মিলিটারির মেজর এসে বলল, বাঙালি সরজা সরজা। তখন সবাই সেখান থেকে ছুটে চলে যায়। মিলিটারি তখন ট্রেনটি নিয়ে জয়পুরহাটের দিকে রওনা হলো। তার দুই দিন পর মিলিটারি ক্যাম্প করার জন্য জামালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে আসে। ক্যাম্প করার কয়েকদিন পরে রাত বারোটা হতে গোলাগুলি শুরু হয়। বিমানযোগে এসে বোমা মেরে রেলের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় এবং তখন থেকে যুদ্ধ শুরু হয়। মিলিটারি গ্রামে গ্রামে এসে মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাদের ওপর অত্যাচার করে। আমাদের পাশের গ্রামে হিন্দুদের বাড়ি ছিল। হিন্দুদের সব বাড়ি মিলিটারি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। সব কিছু লুটপাট করে নিয়ে যায়। ভয়ে তারা পালিয়ে ভারতে চলে যায়। এসব দেখে আমরা চাল ভর্তি ডাবর মাঠের মেঝেতে পুঁতে রাখি এবং গরু-ছাগল নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে যাই। তারপর দুইজন রাজাকার মিলিটারিদের নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করে। রাস্তা খারাপের জন্য ভেতরে যেতে পারল না। সেখান থেকে দুটি মোরগ ধরে ক্যাম্পে চলে যায়। আর গ্রামের সব লোক ছোটাছুটি করে পালিয়ে বেড়ায়। দেশ স্বাধীন হবার দুইদিন পূর্বে আমি জমিতে কাজ করছিলাম এমন সময় মিলিটারিদের আসা দেখে লোকজন ছোটাছুটি করে। এসব দেখে আমিও আখের জমিতে লুকাই। দেখলাম, একটা লোকের পা বেঁধে লম্বা রশি দিয়ে গাছের ওপর ঝুলিয়ে মাথা

নিচের দিকে দিয়ে খেজুরের কাঁটা দিয়ে তাকে পেটাচ্ছে। এরপর যখন মিলিটারি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল তখন আমার এক চাচাতো ভাই বলল, 'জয় বাংলা'। তখন মিলিটারিরা আমার ভাইকে গুলি করে হত্যা করল।

সূত্র; জ-৭৮৪৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
নিলুফা খাতুন	**মরিয়ম বেগম**
গোপীনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক : দাদি, বয়স : ৬০
৭ম শ্রেণি, খ শাখা, রোল : ৩৮	

সাঁওতাল মেয়ের ওপর অত্যাচার

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে নাটোর জেলা থেকে প্রায় দশটি পরিবারের ৪০ জন সাঁওতাল আমার নানার গ্রামে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। শ্রমিক হিসাবে আউশ ধান ও পাট ক্ষেত নিড়ানির কাজ করতে থাকে। পাকহানাদার বাহিনীর দালালের গোপন সংবাদে আক্কেলপুর থানা ক্যাম্প থেকে কয়েকজন পাকহানাদার আমাদের গ্রামে প্রবেশ করে ওই সাঁওতাল পরিবারের দিকে যেতে থাকলে পুরুষ সাঁওতালরা ভয়ে পালিয়ে পাশের কচুরিপানার মজাপুকুরে ও পাট ক্ষেতে লুকিয়ে থাকে। কয়েকজন সাঁওতাল মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করে এবং পাঁচ জন সাঁওতালকে ধরে গ্রামের পূর্ব দিকে ঐতিহাসিক মেলা গোপীনাথপুর গ্রামে সাবেক জমিদার বাড়ি নিয়ে যায়। জমিদার বাড়ির সিংহ দরজাটি ভেঙে চূর্ণবিচুর্ণ করে। পরিশেষে গ্রামের পূর্ব দিকে মাঠের মধ্যে নিয়ে সাঁওতালদের গুলি করে মেরে পুনরায় ক্যাম্পে ফিরে যায়। এরপর স্থানীয় লোকজন সাঁওতালদের একটি গর্তে পুঁতে রাখে।

দ্বিতীয় ঘটনা : ১০ জন উচ্চপর্যায়ের সুশিক্ষিত নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধাকে নির্মমভাবে হত্যা:

সম্ভবত '৭১-এর অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিলি সীমান্ত ফাঁড়ি অতিক্রম করে সর্বপ্রথম ১০ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের মুক্তিবাহিনীর একটি সুশিক্ষিত নির্ভীক দল বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত ও স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে, জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর থানা হানাদার ক্যাম্পের উত্তর পাশ দিয়ে গোপীনাথপুরের মেলা হয়ে বগুড়া জেলার দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে আক্কেলপুর থানা থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে ভানুরকান্দা নামক গ্রামে পৌঁছে একটু বিশ্রাম করছিল। তখন সময় আনুমানিক বেলা তিন ঘটিকা। ভানুরকান্দা ও পার্শ্ববর্তী চক্রপাড়া গ্রামের ক'জন পাকবাহিনীর দালাল ওই মুক্তিবাহিনীর দলটিকে আটকিয়ে রাখে।

অতঃপর গোপনসূত্রে একজন দালাল অতি তাড়াতাড়ি আক্কেলপুর থানা ক্যাম্পে সংবাদ দিলে সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পাকহানাদার এসে দালালদের সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনীর দলটিকে ঘেরাও করে থানা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। বর্বর হানাদার বাহিনী, মুক্তিবাহিনীর দামাল ছেলেদের গায়ের চামড়া উঠানোসহ বিভিন্ন রকমের কষ্ট দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের মধ্যে একজনমাত্র কোনো রকমে পালিয়ে আত্মগোপন করে বেঁচে যায়।

তৃতীয় ঘটনা : আমার নিজ গ্রামের হযরত আলী নামক জনৈক শ্রমিকের শেলের আঘাতে মৃত্যু:

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়। আমার দাদার কাজের লোক হযরত আলী জৈব সারের একটি ভারবহন করে বাড়ি থেকে ক্ষেতে যাচ্ছিল। প্রায় বেলা এগারোটা বাজে। ওই সময়ে আক্কেলপুর থানা ক্যাম্প থেকে পাকবাহিনীর একটি দল দালালদের সহযোগিতায় মেলা গোপীনাথপুর গ্রামের সাবেক জমিদার বাড়ি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আসতে থাকে। আক্কেলপুর থানা ক্যাম্প থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে চন্দ্রপাড়া নামক গ্রামে পৌঁছলে জানতে পারে জমিদার বাড়িতে মুক্তিবাহিনীর একটি বিরাট দল অবস্থান করছে। তখন তারা সেখান থেকেই চারটি শক্তিশালী শেল জমিদার বাড়ি লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করে। ওই শেল জমিদার বাড়ির এক কিলোমিটার পশ্চিমে আমার দাদার ক্ষেতের জমির পার্শ্বে পুকুরের পাড়ে পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো একে একে বাস্ট হয়। বাস্ট হওয়ার পর শেলের ভেতরের ছররা গুলি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে কাজের লোক হযরত আলী ক্ষেতে পৌঁছলে বেশ কয়েকটি ছররা তার শরীরে প্রবেশ করে এবং তার শরীর সঙ্গে সঙ্গেই

ছিদ্র হয়ে যায়। অতঃপর সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ঠিক ওই মুহূর্তে গ্রামে হাহাকার পড়ে যায় এবং সমস্ত গ্রামবাসী ভয় পায়।

গ্রামের লোকজন এবং ঘটনার বর্ণনাকারী আমার নানাও ঘটনাস্থলে যায়। অতঃপর সবাই মিলে হযরত আলীকে তার নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। তার শরীর থেকে রক্ত ঝরতে থাকে এবং নাক ও মুখ দিয়ে সাদা ফেনা বের হতে থাকে। এ অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পরে গ্রামবাসী তাকে সমাধিস্থ করে।

এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলো জানার পর আমি তখনকার মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত ঘটনা বুঝতে সক্ষম হয়েছি।

সূত্র: জ-৭৮৫৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
রাজিয়া সুলতানা রিমু	**মো. জব্বার চৌধুরী**
গোপীনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স: ৬৫ বছর
৮ম শ্রেণি, খ শাখা	সম্পর্ক: দাদা

এক সারিতে দাঁড় করিয়ে গুলি করে

১৯৭১ সালের ১২ নভেম্বর আমাদের গ্রামকে ঘিরে ফেলে পাকিস্তানিরা। তারা আমাদের গ্রামের কয়েকজন লোককে ধরে নিয়ে যায়। তার মধ্যে ছিল আমার দাদু। এছাড়া অন্য গ্রামের কয়েকজন লোককেও তারা ধরে নিয়ে যায়। সব মিলিয়ে তারা ১৫-১৬ জন হবে। তাদেরকে ধরে নিয়ে একটি গর্তের সামনে সবাইকে এক সারি করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে গর্তের ভেতর পুঁতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরে আত্মীয়-স্বজনরা তাদের দেহ তুলে নিজ নিজ স্থানে কবর দিয়েছিল।

সূত্র; জ- ৭৭০৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সুলতানা আক্তার	**মো. আলেক ফকির**
মাহমুদপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : সমন্তাহার
৮ম শ্রেণি, রোল : ১৮	বয়স : ৫৫, সম্পর্ক : বড় আব্বু

সবাই তা দেখে স্তব্ধ

আমার দাদি একজন বৃদ্ধ মহিলা। তিনি ছোটবেলায় বাংলার অসহায় মানুষের ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছেন। আমার দাদির বাবার বাড়ি পাঁচবিবি জেলার ভগবানপুর গ্রামে। আমার দাদির বাবা ছিলেন একজন গ্রাম্য ডাক্তার। দাদি একদিন তার বাবার সাথে ডাক্তারখানায় ছিলেন। এমন সময় অনেক মিলিটারি এসে ডাক্তারখানা ঘিরে ফেলে। দাদি বুদ্ধি করে ডাক্তারখানার দরজার পর্দার আড়ালে লুকায়। দাদির বাবাকে তারা ধরে নিয়ে যায় বাইরে। নিয়ে গিয়ে বলে, তু কী করতা হ্যায়। তেরি শরীলমে এতনা মাংস কেন। তুই এতনা ফরছা কেন এ্যা ছালা।

তখন তিনি বললেন, আমি ডাক্তার মানুষ, আমি সব সময় বসে থেকে কাজ করি, রোদে যাই না, তাই আমি ফরসা এবং আমার শরীরে মাংস বেশি। আমাকে মারবেন না। এই সব বলার পর তারা সেখান থেকে চলে যায়। আর একদিন দাদি ফুফুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। তখন গ্রীষ্মকাল। দাদি বিশ্রামের জন্য ফুফুর ঘরের ভেতরে

যান। দাদির ফুফাতো বোন ও তার স্বামী এসেছিল বাপের বাড়িতে বেড়াতে। ফুফাতো ভাইও এসেছিল গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে। তারা সবাই ছিল ঘরের মধ্যে। এমন সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এসে তাদের বাড়ি ঘেরাও করে। তারপর কয়েকজন সৈন্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। দাদি তা দেখতে পেয়ে বুদ্ধি করে খাটের নিচে চট করে লুকিয়ে পড়ে। তারপর তারা এই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। দাদির ফুফাতো ভাই এবং ফুফাতো বোনের স্বামীকে এক সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে কয়েকটা গুলি করে। গুলির শব্দে দাদির কানের তালু ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। তারপর তারা দাদির ফুফাতো বোনকে ধরার জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় যে গিয়ে সে লুকিয়েছিল তারা আর খুঁজে পায়নি। তারা চলে গেল। তারপর দাদি খাটের নিচে থেকে বের হয়ে ঘটনা দেখে জোরে একটা চিৎকার দিয়ে উঠে। ফুফু, ফুফাতো বোন এবং বাড়ির মধ্যে যারা সেখানে লুকিয়ে ছিল সবাই ছুটে এলো ঘরের মধ্যে। এসে সবাই তা দেখে স্তব্ধ। এই মর্মান্তিক ঘটনা দেখার জন্য পাড়া প্রতিবেশীরা সবাই বাড়িতে ভিড় জমায়।

সূত্র: জ-৭৭৪১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শামছুন নাহার	**জিবননেছা**
কৃষ্ণনগর উচ্চ বিদ্যালয়	কৃষ্ণনগর ফকিরবাড়ী
৯ম শ্রেণি, রোল :...	বয়স : ৫৯ বছর

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর আর নেই

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তখন আমি দশম শ্রেণির ছাত্র। মূলত শেখ মুজিবের ভাষণ শুনে আমি মনে মনে স্থির করলাম মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। তখন চারদিকে এক ভয়ংকর অবস্থা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যেখানে-সেখানে গুলি করে হত্যা করছে মানুষ। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে চুপি চুপি ভারতের পথে পা বাড়ালাম। ভোর হলো ভারতে গিয়ে। প্রথমে কামারপাড়া নামক স্থানে গিয়ে দেখি আমার ক্লাসের দুই বন্ধু আজাহার ও আ. মান্নান মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ট্রেনিং গ্রহণ করছে। তখন আমিও ট্রেনিং শেষ করলাম। তারপর ৭ নং সেক্টর কমান্ডার কর্নেল নূরুজ্জামানের নেতৃত্বে সম্মুখ যুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জ এফএফ কোম্পানিতে দায়িত্ব পালন করতে থাকি। আমার জীবনে সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা যেদিন আমরা মহানন্দা নদী পার হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ইপিআর ক্যাম্প আক্রমণ করি। উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল গোলাগুলির পর পাকসেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু দেখা গেল আমার ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর আর নেই। তার পরের দিন ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলো।

সূত্র: জ-৭৭৪৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. শামীম হোসেন	**মো. সানোয়ার হোসেন (বীর মুক্তিযোদ্ধা)**
কৃষ্ণনগর উচ্চ বিদ্যালয়	৭নং সেক্টর, বি কোং
৮ম শ্রেণি, রোল : ২৮	

সেই অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠিয়ে দিলেন

আমার দাদুরা ছিল দুই ভাই। আব্দুস সালাম ও নজরুল ইসলাম আমার বাবাকে তাদের সঙ্গে ক্ষেতলাল কাচারীপাড়া নামক হাটে মিষ্টি কুমড়া বিক্রি করতে নিয়ে যায়। আমার ছোট দাদু হাটের মধ্যে হারিয়ে যায়।

আমার দাদু তাকে খুঁজতে থাকলে একজন লোক জানায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা ছোট দাদুকে ধরে নিয়ে গেছে। এতক্ষণে হয়তো ফায়ারের জন্য লাইনে দাঁড় করিয়েছে। আমার দাদু সোজা চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্পে।

সেখানে যাওয়ার পর তাদের সাথে দেখা করেন এবং তিনি উর্দু ভাষায় কথা বলতে পারতেন বলে তাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথোপকথন চলে। অবশেষে তারা আমার দাদুকে একটা শর্ত দেয়। শর্তটা হলো, সে যদি তার ভাইকে ফেরত চায় তাহলে তাকে রাজাকার হতে হবে। আমার দাদু প্রথমে প্রতিবাদ জানান। কিন্তু পরে তার ছোট ভাইকে বাঁচানোর জন্য বাধ্য হয়ে রাজাকার হওয়ার প্রস্তাবে রাজি হন। তারপর তারা বাড়িতে চলে আসেন। বাড়িতে আসার পর তিনি চিন্তা করেন যদি তিনি রাজাকার হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে থাকেন তাহলে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ পাবেন এবং দিনের বেলা তাদের সাথে থাকবেন এবং রাতের আঁধারে সেই অর্থ মুক্তিফৌজদের দিয়ে সহায়তা করতে পারবেন। যেই চিন্তা সেই কাজ।

রাজাকার হয়ে যা অর্থ পেতেন রাতের বেলায় লুকিয়ে মুক্তিফৌজদের দিতেন। তারপর ইলেকশন হয়। তিনি মেম্বারে দাঁড়ান এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। হঠাৎ পাকিস্তানিরা দাদুকে সন্দেহ করতে থাকে এবং তাকে নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকে।

দাদু বুদ্ধিমান হওয়ার কারণে তার উপস্থিত বুদ্ধিতে সেদিন বেঁচে যান। তারপর পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের এলাকায় জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। সেদিনও আমার দাদু বলেন যে, আমি তো রাজাকার আমি গ্রামেও কিছু রাজাকার তৈরি করেছি। আপনারা যদি চান তাহলে আমি নিজেই তাদের নিয়ে আমার এলাকা শাসন করতে পারি। আর প্রয়োজন তো অস্ত্রের। তাই কিছু অস্ত্র আমায় দিন। পাকসেনার ক্যাপ্টেন দাদুকে বিশ্বাস করে এবং কিছু অস্ত্র তাকে দেয়। সেই অস্ত্র দাদু বাড়িতে আনেননি। রাতে মুক্তিফৌজদের সেই অস্ত্র দাদু পার করে দেন। ক্ষেতলাল থানা ছিল ৭নং সেক্টরে। সে সেক্টরের মুক্তিফৌজদের তিনি সহায়তা করেন।

একদিন রাতে তিনি মুক্তিফৌজদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন না। আর সেজন্য কিছু গোপন তথ্যও তিনি তাদের জানাতে পারেননি। এদিকে পাকিস্তানিরা তৈরি হচ্ছে মুক্তিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। দাদু কী করবেন ভেবে পান না। ভাবতে ভাবতে তিনি একটা চিঠি লিখে ফেলেন প্রয়োজনীয় তথ্য মুক্তিফৌজদের দেওয়ার জন্য। চিঠি লেখার পর তিনি ভাবেন কার হাতে এই চিঠি পাঠানো যায়। বিশ্বস্ত মানুষ তিনি খুঁজে পান না।

এদিকে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন তাকেও ডেকে পাঠান। তখন আমাদের এলাকায় দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। কোনো চাল পাওয়া যায় না। আমার দাদু মেম্বার হওয়ায় তিনি কিছু আটা পান এবং পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনও তাকে নিজের পরিবারের জন্য কিছু আটা দেয়। দাদু সেই আটা এনে নিজের পরিবারের জন্য ব্যবহার না করে এলাকার লোকের জন্য রুটি তৈরি করেন এবং নিজের জমির মিষ্টি কুমড়া দিয়ে ঘণ্ট তৈরি করে বিনামূল্যে খাওয়ান। প্রতিটি গ্রাম থেকে লোকজন তার হোটেলে আসতে থাকে। নিজেরা খাওয়ার পর পরিবারের অন্য লোকদের জন্য নিয়ে যেতে থাকে। এজন্য দাদুকে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নির্মম নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এদিকে তার লেখা চিঠি তার এক সহচরের হাতে পাঠিয়ে দেয় মুক্তিফৌজের উদ্দেশে। কিন্তু তার সহচর তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ওই চিঠি পাকহানাদারদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। পাকহানাদার সেই রাতেই আমার দাদুর বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং দাদু ঘরের চালার ওপর জীবনের ভয়ে লুকিয়ে থাকেন। তারা দাদুকে খুঁজে বের করে এবং তার গলায় ছুরি চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। এদিকে মুক্তিবাহিনীও পুরো প্রস্তুত। তারা ট্রেনে এসে আক্রমণ করে ক্ষেতলাল। কোণঠাসা করে ফেলে পাকিস্তানি বাহিনীকে। তাদের সারিয়াকান্দি দিয়ে বগুড়ার জেলখানায় নিয়ে বন্দি করে। কিন্তু দাদু সে চিঠিতে কি তথ্য মুক্তিবাহিনীকে জানাতে চেয়েছিলেন তা আজও অজ্ঞাত। দাদুর ভেতরের মানুষটি প্রকাশ পাওয়ার আগেই তাকে চিরতরে এই সুন্দর পৃথিবী ছাড়তে হয়। আমার দাদুর মতো যে আরও কত নিরীহ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে তা আজও জানা নেই। কতো মানুষ যে বাধ্য হয়ে রাজাকার সেজেছে তারও হদিস নেই।

সুত্র:জ-৭৭৫০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী

আনজুয়ারা খাতুন	**মন্তেজার মণ্ডল**
কৃষ্ণনগর উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : কৃষ্ণনগর কাচারীপাড়া, জেলা :
৮ম শ্রেণি	জয়পুরহাট
	বয়স : ৭০ বছর